The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp.187 -194)
Published in October, 2025

সোনালী কাবিন কাব্যে ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের পর্যালোচনা ও বিচার

মোঃ আরিফুল ইসলাম *

প্রতিপাদ্যসার: *সোনালী কাবিন* কাব্যের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের অণ্বেষণই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য । নগরজীবনের উন্মাদনাকে পাশ কাটিয়ে এ কাব্য বাংলা কবিতাকে পুনরায় পৌঁছে দিয়েছে তার বহুবর্ণিল প্রকৃতি ও পরিবেশের কোলে। বর্তমান প্রবন্ধে *সোনালী কাবিন* কাব্যে প্রতিফলিত বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি পর্যালোচনা বিবৃত করা হলো। এ কাব্যে বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিচ্ছবি অঙ্কনে কবি আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯) যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। যান্ত্রিক নগরে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া মানব মনের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি *সোনালী কাবিন*। উপমা, রূপক, চিত্রকল্প প্রভৃতির সমাহারে বাংলার প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে *সোনালি কাবিন* কাব্যে। এই প্রবন্ধে অনুসরণ করা হয়েছে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research)। এ গবেষণাটি *সোনালি কাবিন* এর ভূ-প্রকৃতিকে পাঠক ও সমালোচকের কাছে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবে।

মূখ্য শব্দ : ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ, নদী, কৃষি, দুর্যোগ।

ভূমিকা

স্বতন্ত্র কাব্যকাঠামো ও নান্দনিক শিল্পবোধের মার্গীয় আসনে উত্তীর্ণ হয়ে যে কয়জন দুর্লভ প্রতিভা বাংলা কবিতার জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে পঞ্চাশের দশকে আবির্ভূত কবি আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯) অন্যতম। ভিন্নধর্মী কাব্যিক প্রকল্প ও স্বতন্ত্র শিল্পবিভায় যিনি কবিতায় যোগ করেছেন নতুন এক মাত্রা। রবীন্দ্রবলয় থেকে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে বাংলা কবিতার ভুবন যখন ত্রিশের দশকের নাগরিক ডামাডোলে আচ্ছন্ন, কবিতার শরীর থেকে সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যখন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে; ঠিক তখনই বাঁকবদলের এক মহামন্ত্র নিয়ে আল মাহমুদের আগমন। নগরজীবনের হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা নয়, কবিতায় তিনি নিয়ে এলেন চিরায়ত বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা গ্রামীণ জীবনের মোহনীয় রূপ। তাঁর কবিতার চরণগুলো যেন গ্রাম-বাংলার আঁকাবাঁকা মেঠোপথ। কবিতার পাঠক ও সমালোচকেরা প্রাণভরে এই মেঠোপথে হাঁটতে শুরু করলেন। কবিতার ভূগোল থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া বাংলার নিটোল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মাটির ঘ্রাণে মিশে থাকা মানুষেরা আবারও ফিরে এলো নিজেদের স্থানে। *সোনালী কাবিন* কাব্যের ভূ-প্রকৃতি নিয়ে ইতঃপূর্বে কোনো আলোচনা চোখে পড়েনি তাই এই গবেষণাটি মৌলিক । গবেষণাটির সকল উপাত্ত মাধ্যমিক উৎস হতে গৃহীত।

পঞ্চাশের দশকে আবির্ভূত কবি আল মাহমুদ কাব্যচর্চায় আজন্ম স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরক্ত থেকেছেন। রচনার বৈশিষ্ট্যে তাঁর কবিতা যেন এক টুকরো বাংলাদেশেরই প্রতিচ্ছবি। বারোশত নদী পরিবেষ্টিত এ ভূখণ্ডই যেন আল মাহমুদের চূড়ান্ত গন্তব্য। এই বাংলার মাটি, জল ও মানুষই তাঁর একমাত্র উপজীব্য। এ দেশের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি এবং বর্ণিল জনসাধারণের অনবদ্য উপস্থাপনে আল মাহমুদ অসামান্য সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। ইট-পাথরের নাগরিক জীবনকে দূরে ঠেলে তিনি কবিতাকে বারবার শিকড়ে ফিরিয়ে এনেছেন। আল মাহমুদের এরকম কাব্য

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচেষ্টার সর্বোত্তম প্রকাশ দেখা যায় তাঁর বহুল পঠিত ও আলোচিত *সোনালী কাবিন* (১৯৭৩) কাব্যটিতে। এ কাব্যের প্রতিটি কবিতাই যেন আবহমান বাংলার ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা একেকটি আদুরে সন্তান। কবিতাগুলোতে বাংলাদেশের জলবায়ু, পরিবেশ ও জনজীবনের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। কাব্যচিন্তায় কবি কোনো ভিনদেশি জনপদের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হতে চাননি, বরাবরই প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের মাটি ও মানুষসংলগ্ন থেকেছেন। সমালোচকের ভাষায়,

> আল মাহমুদ সাত ঘাট পেরিয়ে অবশেষে মোল্লাবাড়ির ঐতিহ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন (ফাইজুল ৭)।

সোনালী কাবিন কাব্যে উল্লেখিত এই মোল্লাবাড়ি কেবল আল মাহমুদের জন্মস্থান মোল্লাবাড়ি হয়েই থাকেনি, কাব্যিক সুষমায় এ মোল্লাবাড়ি যেন আমাদের প্রিয় বাংলাদেশরই প্রতিচ্ছবি। এ মোল্লাবাড়ি তথা বাংলাদেশের বহুবর্ণিল প্রকৃতি ও পরিবেশের এক অনবদ্য দলিল যেন *সোনালী কাবিন*। এ কাব্যে,

> আবহমান বাংলা জ্বলজ্বলে হয়ে ফুটে উঠলো (ফাইজুল ৯৭)।

বাংলার আকাশ, বাংলার মাঠ-ঘাট, নদী-নালা ও পাহাড়-পর্বতের বিশৃস্ত বয়ানে *সোনালী কাবিন* এক অবিস্মরণীয় দলিলে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের একনিষ্ঠ উপস্থাপনে সমৃদ্ধ *সোনালী কাবিন*। এ কাব্যের কবিতাগুলোয় আল মাহমুদ বাংলার বর্ণময় প্রকৃতির পশরা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কাব্যটির প্রথম কবিতার নাম হল 'প্রকৃতি'। এ প্রকৃতি বাংলাদেশের চিরচেনা গ্রামীণ প্রকৃতি। যেখানে আবহমান বাংলার পল্লিজীবনের এক মায়াময় দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। এ প্রকৃতির অপার দানেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের জনসংস্কৃতি ও সভ্যতা। বাংলাদেশের জলবায়ু ও ঋতুবৈচিত্র্যের অপূর্ব সমাহার *সোনালী কাবিন* কাব্যকে করেছে অনন্য। বাংলাদেশের এই অনিন্দ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই তাঁর চিরআস্থা। তাই,

> নগর থেকে আল মাহমুদের কাব্য যাত্রা শুরু হলেও আবহমান বাংলার নিসর্গই হলো তার গন্তব্য (গাউসুর ৯)।

'প্রকৃতি' কবিতায় আল মাহমুদ তাই চিরচেনা বাংলাদেশকেই তুলে ধরেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎকর্ষে পৃথিবী বহুদূর এগিয়ে গেলেও কবি রয়ে গেছেন, তাঁর জন্মভূমি এই বাংলার মাটিতেই। কবি বলে ওঠেন,

> কিন্তু আমি এই ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে আজও উবু হয়ে আছি।
> ক্ষীরের মতোন গাঢ় মাটির নরমে কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
> ভাবলাম, এ মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার (মাহমুদ ৭)।

কবি এই ঘোরেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চান। উর্বর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশই, বাংলাদেশের মানুষের কৃষি জীবনকে তরান্বিত করেছে। এ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবেই মানুষের দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত হয়। খাদ্যাভ্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। অনুকূল আবহাওয়ার কারণে ধান বাংলাদেশে উৎপাদিত অন্যতম প্রধান কৃষি পণ্য। ফলে এদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য হলো ভাত। এজন্য এদেশের মানুষকে বলা হয় মাছে-ভাতে বাঙালি। প্রকৃতির অপার দান এদেশের উর্বর মাটি। উজান থেকে নেমে আসা নদীবিধৌত পলি এদেশের মাটিকে করেছে সোনার চেয়ে দামি। ফসলের সমারোহে এই মাটি যখন হেসে ওঠে তখন যেন হেসে ওঠে পুরো বাংলাদেশ। তাই এই মাটি কবির কাছে পরম আরাধ্য প্রিয়তমার মতো। তবে এই প্রিয়তমাও কিন্তু একজন কিষাণী। সমালোচকের ভাষায়,

> কৃষি জীবন সন্নিহিত বিশ্বাস পরম্পরাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও আল মাহমুদ বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন (গাউসুর ১০)।

সুতরাং বলা যায় কৃষি জীবন সংলগ্নতাই আল মাহমুদের কবি জীবনকে করেছে অনন্য, যার সার্থক প্রমাণ *সোনালী কাবিন*।

সোনালী কাবিন কাব্যে ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের পর্যালোচনা ও বিচার

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চল। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা-খরা ও ঘূর্ণিঝড় এদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। ভাটি অঞ্চলে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশকে প্রায় প্রতিবছরই ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হতে হয়। বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের নদীগুলো গর্ভবতী নারীর মতো ফুলে ওঠে। যেখানে চোখ যায় শুধু জল আর জল।

'বাতাসের ফেনা' কবিতায় আল মাহমুদ বন্যার আঘাতে জর্জরিত এদেশের মানুষের সংগ্রামী জীবনের চিত্র এঁকেছেন। উজান থেকে নেমে আসা ঢলের পানিতে প্রতিবছর ভেসে যায় পুরো বাংলাদেশ। শুরু হয় নদী ভাঙনের এক নিষ্ঠুর খেলা। রাক্ষসী নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলোতে মানুষের জীবন হয়ে ওঠে বিপন্ন। যেসব নদীর বয়ে আনা পলিমাটির দানেই গড়ে উঠেছে এই বাংলাদেশ, সেসব নদীই হয়ে উঠে সর্বগ্রাসী। নদীর করালগ্রাস কেড়ে নেয় সবকিছু। কবি বলেন,

> চড়ুইয়ের বাসা, প্রেম, লতাপাতা বইয়ের মলাট
> দুমড়ে মুচড়ে খসে পড়ে। মেঘনার জলের কামড়ে
> কাঁপতে থাকে ফসলের আদিগন্ত সবুজ চিৎকার (মাহমুদ ৮)।

এভাবেই নদী সবকিছু কেড়ে নিয়ে মানুষকে করে সর্বস্বান্ত। সর্বস্ব হারিয়ে মানুষ হয়ে পড়ে নিঃস্ব। অসহায় মানুষ মাথাগোঁজার ঠাঁই হারিয়ে নেমে আসে রাস্তায়। *সোনালী কাবিন* এর কবিতাগুলোতে নদীভাঙন ও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের নির্মম চিত্র অঙ্কন করে এভাবেই আল মাহমুদ সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। *সোনালী কাবিন* কাব্যে আল মাহমুদের বারবার বাংলার প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি তাঁর হৃদয়ের ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন এই বাংলার প্রকৃতির নানাবিধ রূপ। সমালোচকের মতে,

> উপকরণ-নির্বাচনে কবির আত্মবিশ্বাসটি বড় উদাহরণ। সদ্য স্বাধীন দেশে তাঁর কাব্যবিষয় ঐ আবহাওয়া-জলবায়ু পরিক্রমণে (ইকবাল ১৬১)।

এই পরিক্রমণের অভিজ্ঞতায় কবি কখনো এঁকেছেন এই প্রকৃতির মায়াময় রূপ আবার কখনো এঁকেছেন ভিন্ন রূপ। যেমন, প্রেমিক হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশেও এই প্রকৃতি প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে। কবি-হৃদয়ের বিষন্ন ভাষা যেন সবার আগে প্রকৃতি বুঝে ফেলে। প্রেমিকমনের গভীরে ডুবে থাকা অতীতের মধুময় স্মৃতির সহযোগী হিসেবে প্রকৃতিই এগিয়ে আসে। যেমন 'দায়ভাগ' কবিতায় কবি শুধু ফেলে আসা দিনের সেই প্রেয়সীকেই ভুলতে পারেন না, সেই সঙ্গে ভুলতে পারেন না সোনালী সময়ে কাটানো বাংলার অপরূপ প্রকৃতিকেও। এখানে বাংলার প্রকৃতি ও প্রেয়সী দুটোই কবির মানসপটে ভালোলাগার দোলা দিয়ে যায়। তাইতো বলে ওঠেন,

> ভোলো না কেন ভুলতে পারো যদি চাঁদের সাথে হাঁটার রাতগুলি নিয়াজ মাঠে শিশির-লাগা ঘাস
> পকেটে কার ঠাণ্ডা অঙ্গুলি ঢুকিয়ে হেসে বলতে, অভ্যাস; বকুলডালে হাসতো বুলবুলি (মাহমুদ ৯)।

এ পঙক্তিগুলোতে কবি বাংলার চিরায়ত শীতকালের বিমুগ্ধ রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। শিশির ভেজা মাঠে প্রেয়সীর সঙ্গে কাটানো দিনগুলো কবি-হৃদয়ে আজো বীণার তারের মতো বেজে ওঠে। জোছনা রাতের বাংলা যেন এক অপরূপ ছবি। এ ছবি বড়ো মায়াময়। এছাড়াও 'কবিতা এমন' নামক অপর একটি কবিতায়ও আল মাহমুদ বাংলার মাটি ও মানুষকে শৈল্পিক সুষমায় উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কাছে,

> কবিতা তো ফিরে যাওয়া পার হয়ে হাঁটুজল নদী কুয়াশায়-ঢাকা-পথ,
> ভোরের আজান কিম্বা নাড়ার দহন পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ মাছের আঁশটে গন্ধ,
> উঠোনে ছড়ানো জাল আর বাঁশঝাড়ে ঘাসে ঢাকা দাদার কবর (মাহমুদ ১০)।

উল্লেখিত কবিতায় কবি এ বাংলার প্রকৃতির গান তথা নদী, চরাঞ্চল, মাটি ও মানুষের এক অনবদ্য চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। বাংলার এ প্রাকৃতিক রূপ কবির কাছে যেন কোনো দুরারোগ্য রোগের প্রতিষেধক। মধুময় এ প্রকৃতির সৌন্দর্যে স্নাত হয়ে তিনি পৌঁছে গেছেন অমরত্বের দুয়ারে। বাংলা কবিতার পাঠকেরাও যেন প্রাণভরে ফিরে পেলো

চিরায়ত বাংলার ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা সৌন্দর্যের রূপ, রস ও গন্ধ। পরম মমতায় কবি তাই আলোচ্য কাব্যে বাংলার ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের এক অনবদ্য চিত্র এঁকেছেন। তাইতো,

> নগরে বসবাস করেও তিতাস নদী, নদী তীরের জনপদের স্মৃতি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারেন না। ফলে এই জনপদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ষড়ঋতুর বিবিধ বিন্যাস নিয়ে রচনা করেন প্রাণবন্ত সব কবিতা (গাউসুর ৩০)।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৮৫৪) কাব্যবোধ নির্মাণে যেমন রয়েছে ধানসিঁড়ি নদীর প্রভাব, মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) কপোতাক্ষ নদ এবং হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) পদ্মা তেমনই আল মাহমুদের কাব্যবোধ নির্মাণেও রয়েছে তিতাস নদীর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব।

বাংলার প্রকৃতির রূপে চিরআসক্ত কবি আল মাহমুদ। *সোনালী কাবিন* এর পাতায়-পাতায় এই অনাবিল আসক্তির প্রমাণ মেলে। এখানে কখনো বর্ষায় নদীর মাতাল রূপ কখনো শীতের শিশিরে ভেজা গ্রামীণ জনপদের ছবি, কখনোবা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের দৃশ্যও চিত্রায়িত হয়েছে। কবির সংবেদনশীল মনের ক্যানভাসে এই ভূখণ্ডের বর্ণিল প্রকৃতি ও উর্বর মাটির ছবি পরম যত্নে ভেসে ওঠে। নাগরিক জীবনে নেই কাঙ্ক্ষিত প্রশান্তির আহবান। তাই,

> আল মাহমুদ ব্যতিক্রম ; তিনি এলিয়টীয় নগর-নিসর্গকে পাশ কাটিয়ে ফিরে গেলেন আবহমান কালের গ্রাম-প্রকৃতির ভেতর (খোন্দকার ২৩)।

আলোচ্য কাব্যে দেখা যায়, কবির অন্য ভাই-বোনেরা যেখানে নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজেদের গন্তব্যে যাত্রা শুরু করে, কবির যাত্রা সেখানে অত্যন্ত ধীরপায়ে। তিনি যেন থেকে যেতে চান তাঁর চিরচেনা প্রাঙ্গণে। এখানে নেই কোনো নাগরিক জটিলতা, রয়েছে পরম শান্তি। ছয় ঋতুর দেশ এই বাংলাদেশ। এখানে প্রতিটি ঋতুই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত। *সোনালী কাবিন* কাব্যে একেক ঋতু একেক সুষমা নিয়ে হাজির হয়েছে। তাইতো কবি শহরগামী ট্রেনে না উঠে আবারও ফিরে আসেন কুয়াশায় মোড়া অনন্য সুন্দর গ্রামীণ জীবনে। এই ফিরে আসা যেনো কবির একান্ত মনের ইচ্ছা। কবি বলেন,

> কুয়াশার শাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার ঘরে ফিরবো।
> শিশিরে আমার পাজামা ভিজে যাবে। চোখের পাতায়
> শীতের বিন্দু জমতে জমতে নির্লজ্জের মতোন হঠাৎ
> লাল সূর্য উঠে আসবে। পরাজিতের মতো আমার মুখের ওপর রোদ
> নামলে, সামনে দেখবো পরিচিত নদী (মাহমুদ ১৫)।

এ কবিতায়ও কবি শীতকালের পাশাপাশি বাংলার গ্রামীণ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এক অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। প্রচণ্ড শীতে সবুজ ঘাসে শিশিরের সমারোহ। যেন পুরো গ্রামখানি শীত নিদ্রায় শায়িত। চেনা নদী, চেনা পরিবেশ ছেড়ে কবি কীভাবে নগরের কোলাহলে নিজেকে ছড়িয়ে দেবেন - এই চিন্তায় আবারো গ্রামে ফিরে আসেন। গ্রামের মেঠোপথে হেঁটে বেড়ানোই তাঁর পরম সুখ। এই পথ কবির বহুদিনের চেনা। সমালোচকের মন্তব্য,

> আল মাহমুদ কবিতার সৌরভে মাটির সোঁদা গন্ধের মৌতাত। সে কারণে মৃত্তিকা থেকে
> আল মাহমুদকে কখনো আলগা করেনি তাঁর পদ-যুগল (কমরুদ্দিন ২৯)।

নদীমাতৃক দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। নদীর সঙ্গে রয়েছে এদেশের নিবিড় সম্পর্ক। নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বিভিন্ন হাট-বাজার, বন্দর। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো নদী। এসব নদীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা। সভ্যতার বিকাশে যেমন রয়েছে নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তেমনই বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জীবনমান বিকাশেও এর ব্যতিক্রম নয়। আবহমানকাল থেকেই এই ভূখণ্ডের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে আছে এসব নদী। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাঙালি জীবন বৈচিত্র্যময়। উজান থেকে নেমে আসা এসব নদী প্রচুর পলি নিয়ে আসে। ফলে এদেশের মাটি হয়ে ওঠে উর্বর। তৈরি হয় ফসলের সীমাহীন সম্ভাবনা। বাংলাদেশের চিরায়ত জলবায়ু অক্ষুণ্ন রাখতে এসব নদীর ভূমিকা অপরিসীম।

তাই *সোনালী কাবিন* এর বিভিন্ন কবিতায় বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধানতম উপাদান এই নদীর প্রসঙ্গ বহু রঙে ও বহু বর্ণে বারবারই এসেছে। নদীর প্রতি তীব্র আন্তরিকতায় কবি উচ্চারণ করেন,

> নদী,নদী-
>
> সন্তানেরা উল্লসিত আনন্দের মধ্যে আঙুল তুলে
> যে স্পষ্ট জলধারা দেখালো, তা আমাদের প্রাণ (মাহমুদ ২১)।

বাঙালি জীবনের অনিবার্য সহচর এসব নদীবাহিত পলি দিয়েই ভরে ওঠে এদেশের কৃষি-অর্থনৈতিক প্রাচুর্য। ফলে বাঙালির হৃদয়-মনে আনন্দের দোলা লাগে। অকৃপণভাবে মেতে ওঠে নদী-বন্দনায়। এই নদীগুলোকে ঘিরেই আবর্তিত বাঙালির প্রাণ। কবিও এর ব্যতিক্রম নন। তিনিও মেতে ওঠেন ফসল উৎপাদনের আহবানে,

> স্বপ্নের সানুদেশে আমরা শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেবো বাম দিকে বয়ে যাবে রূপোলি নদীর জল,
> ডানে তীক্ষ্ম তৃষিত পর্বত (মাহমুদ ২২)।

এভাবেই আলোচ্য কাব্যে ভাটির দেশ তথা নদীবিধৌত বাংলার রূপবৈচিত্র্যের প্রতি কবির অমোঘ আস্থার প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়, কারণ ফসল উৎপাদনের সূতিকাগার এসব নদী বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম প্রধান নিয়ামক। তাঁর কাছে পরম কাঙ্ক্ষিত এসব নদী। তাই,

> স্বদেশ চেনায় উদ্বুদ্ধ এই কবি নগর জীবনের চাবুকের আঘাত, অন্তর্জ্বালা দাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে
> ফিরে গেছেন বারবার তিনি নদী-নিসর্গে, গ্রামীণ জীবনধারার অকৃত্রিমতায় (গাউসুর ৩২)।

যেসব ভৌগোলিক অনুষঙ্গে গঠিত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সেগুলোর মধ্যে নদী বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। *সোনালী কাবিন* এ তাই বহুরূপে বহুবার এসেছে নদীর প্রসঙ্গ। আগেই বলা হয়েছে নদীর করাল গ্রাসে সর্বস্বান্ত হওয়া এদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কথা। নদী যখন ক্ষুব্ধ হয়, তখন ভাসিয়ে দেয় দুই কূলের প্রকৃতি ও মানুষকে। তবে *সোনালী কাবিন* এ আল মাহমুদ শুধু নদীর ধ্বংসলীলাই দেখাননি, একইসাথে এ ভূখণ্ডের জনজীবনে তিনি নদীর ইতিবাচক প্রভাবের চিত্রও দেখিয়েছেন। প্রায় প্রতি বছরের নদীভাঙন যেমন মানুষের সবকিছু কেড়ে নেয়, জনজীবনে নেমে আসে ঘোর আঁধার। তেমনই কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি এই নদীভাঙন মানুষকে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতেও শেখায়, আশার বালুচরে নতুন করে ঘর বাঁধতে শেখায়। ভাঙনকবলিত দিশেহারা মানুষ তাই রাতভর জেগে থাকে নতুন কোনো খবরের আশায়। কোথাও যদি চর জাগে সেই চরে আবারও নতুন করে জীবনকে সাজাতে হবে। কবির ভাষায়,

> আমার বাপের ছিল অঘুমের অসুখ। সারারাত ধস নামার শব্দ পোহাতেন।
> কখনো দেখতাম সড়কি নিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছেন।
> আমি তার পেছন নিলে বলতেন, আয়
> কোথায় চর জাগলো দেখে আসি (মাহমুদ ২৮)।

সর্বহারা মানুষ নিজে মাথা গোঁজার জন্য নতুন করে জেগে ওঠা চরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এজন্য তাকে আরেকটি যুদ্ধে নামতে হয়। এ যুদ্ধ ক্ষমতাবান দখলদারের বিরুদ্ধে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমেই এ চরের দখল নিতে হয়। তাই নদী তীরবর্তী মানুষেরা অত্যন্ত সাহসী প্রকৃতির হয়ে থাকে। কিন্তু সাহস, রক্ত ও প্রাণ দিয়েও এ চরের অধিকার সাধারণ মানুষের ভাগ্যে জোটে না। ফলে তারা চিরদিনের জন্য ঠিকানাহীন হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্যহীন এক অজানা গন্তব্যে যাত্রা শুরু করে। কবির ভাষায়,

> তারপর ভাঙনের রেখা পেছনে ফেলে আমরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছিতড়ে পড়লাম (মাহমুদ ২৮-২৯)।

এভাবেই আল মাহমুদ *সোনালী কাবিন* কাব্যে নদীর বহুরূপী চিত্র অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। নদীর আচরণেই নির্ধারিত হয় এ দেশের মানুষের ভাগ্য। নদীর ভাষায় মানুষ কথা বলে, হাসে ও কাঁদে। জলভরা নদীর অনিন্দ্য রূপ মানুষকে উদাসী করে, বিমোহিত করে। নদীর জোয়ার-ভাটার মূর্ছনায় বাঙালি যেন হারিয়ে যেতে চায়

সুরের ভুবনে। সারি গান, ঘাটু গান ও ভাটিয়ালিসহ বিভিন্ন ধারার সংগীতের সৃষ্টিও এসব নদীকে কেন্দ্র করেই। তাই বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পেছনেও এসব নদীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠে আনন্দযজ্ঞ। নদীবিধৌত অঞ্চলগুলোতে শুরু হয় নদীকেন্দ্রিক সংস্কৃতি। সমালোচকের ভাষায়,

> এখানে প্রকৃতির সরলতায় ছড়িয়ে আছে বাস্তব নারী সৌন্দর্য, নদী, নদীর ভাঙ্গন,
> কর্মজীবী সহজ সরল মানুষ (কমরুদ্দিন ৯২)।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জনজীবনের যাবতীয় অনুষঙ্গকে উপজীব্য করে আল মাহমুদ নিরলসভাবে শব্দের চাষাবাদ করেন। গড়ে তোলেন অনন্য এক কাব্যসৌধ। এ সৌধে চোখ রাখলে দেখা যায়, পুরো বাংলাদেশ তার বর্ণিল প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে হাজির। ক্ষণে-ক্ষণে রূপ বদলানো এ প্রকৃতিই বাংলাদেশের মানুষকে করে তোলে পরিশ্রমী। অনুকূল আবহাওয়া যেমন আনন্দের যোগান নিয়ে আসে তেমনই প্রতিকূল আবহাওয়া নিয়ে আসে দুঃখের খবর। তাই কৃষিই এদেশের মানুষের প্রধান জীবিকা। তীব্র রোদ কিংবা প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মানুষেরা ফসলের চাষাবাদ করে। বিরূপ আবহাওয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে থাকা এসব কৃষক কবির কাছে মাটির মানুষ। সহজ-সরল এদের জীবন-যাপন। প্রকৃতির অনিন্দ্যলাবণ্যে মোড়া এদের আটপৌরে জীবন। নগরের মানুষদের এরা সমীহ ও সম্মান প্রদর্শন করে। তাই কবি যখন গ্রামে ফিরে আসেন, এরা অবাক হয়; চিন্তায় পড়ে,

> কে জানে ফিরলো কেনো, তাকে দেখে কিষাণেরা অবাক সবাই তাড়াতাড়ি নিড়ানির স্তূপাকার
> জঞ্জাল সরিয়ে শস্যের শিল্পীরা এসে আলের ওপরে কড়া তামাক সাজালো (মাহমুদ ৪৮)।

এখানে আল মাহমুদ বাংলার কৃষকদেরকে শস্যের শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন। শিল্পী যেমন পরম মমতা ও একাগ্রতায় একের পর এক ছবি আঁকতে থাকেন তেমনই কৃষকেরাও প্রবল ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রমে মাঠ থেকে ফসল উৎপাদন করে টিকিয়ে রাখেন জাতির অস্তিত্বকে। জাতির মৌলিক চাহিদা মেটাতে এসব শস্যের শিল্পীরা ক্লান্তিহীনভাবে জমির চাষাবাদে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। এ শস্যের শিল্পীরা শুধু ফসল উৎপাদন করেই ক্ষান্ত থাকে না, নানাবিধ আয়োজনে মাতিয়ে রাখে বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকেও। প্রতিটি ঋতুতেই বাঙালি মেতে ওঠে বিশেষ আনন্দের ভেলায়। বৈশাখের নববর্ষ, হেমন্তের ধানকাটা উৎসবসহ নানান আয়োজনে আনন্দের ফল্গুধারা বয়ে যায় প্রতিটি বাঙালির জীবনে। তাই,

> আল মাহমুদের কাব্যে ষড়ঋতুর উজ্জ্বলতা পরিলক্ষিত (কমরুদ্দিন ২৭)।

কবিও এই সহজ সরল কৃষিজীবী সমাজেরই বাসিন্দা। জীবনের প্রয়োজনে নগরে গমন করলেও নাগরিক পরিচয়ে কবির তুমুল আপত্তি। কবির মন পড়ে থাকে ফেলে আসা গ্রামের মেঠোপথে। বলে ওঠেন,

> সোনার দিনার নেই, দেন মোহর চেয়ো না হরিণী
> যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দুটি,
> আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনকালে সঞ্চয় করিনি
> আহত বিক্ষত করে চারদিকে চতুর ভ্রূকুটি; (মাহমুদ ৫৩)

আলোচ্য সনেটে কবি যে দুটি হাতের উল্লেখ করেছেন, এ দুটি হাত হলো এই বাংলার চিরসংগ্রামী কৃষকের হাত। এ হাত কেবল পরিশ্রম করতেই জানে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করতে জানে। চারপাশের নোংরা বাস্তবতার ভাষা জানে না এই হাত। কৃষিজীবী সমাজের মানুষের অতিরিক্ত চাহিদা নেই। ফলে এ হাত কোনো ছলনা করতেও জানে না। কবিও তাদেরই একজন। প্রিয়তমার প্রতি কৃষকের এই দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণ কবির কাছে তাই পরম সত্য। সমালোচকের ভাষায়,

> জনপদ, শস্য, হৃদয়-সবই সোনালী কাবিনে এক মহাসত্যের বিভিন্ন দিক (কমরুদ্দিন ৩৩)।

আবহমান বাংলার জলবায়ু ও জনজীবনের সার্থক রূপায়ণে আল মাহমুদের *সোনালী কাবিন* বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। শুধু সমকালীন প্রকৃতি ও পরিবেশই নয়, কাব্যটিতে বাংলার সর্বকালীন ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্র

অত্যন্ত সফলভাবে ফুটে উঠেছে। কবি তাঁর প্রেয়সীকে সম্বোধন করেছেন কখনো হরিণী, কখনো পানোখী, কখনোবা বুনো হংসিনী নামে। প্রতিটি সম্বোধনেই কবি নিজেকে বাংলার চিরন্তন প্রকৃতির সন্তান বলে পরিচয় দিয়েছেন। যার বসবাস এই বাংলার নিসর্গে। তাই প্রেয়সীকে নিয়ে কবি বাংলার নিসর্গের ডানাতেই সংসার জীবনের সূচনা করতে চান। যে সংসারে কৃষিই হবে একমাত্র পেশা। সমালোচকের মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়,

> কৃষি জীবন সন্নিহিত বিশ্বাস পরম্পরাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আল মাহমুদ বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন (গাউসুর ১০)।

তাইতো ফসলকেও তিনি তার প্রেয়সীর মতোই ভালোবাসেন। প্রেয়সীকেও প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে সাহসী কিষাণী হাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। শস্যের বিপদ কবির কাছে প্রেয়সীর বিপদের চেয়ে কম নয়। যারা বাংলাদেশের অগ্রগতির সম্ভাবনাকে থামিয়ে দিতে সদা তৎপর, যারা বাংলাদেশের ফসলকে লুট করে, তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। কবির দীপ্ত উচ্চারণ,

> তোমার শরীরে যদি থেকে থাকে শস্যের সুবাস, খোরাকির শত্রু আনে যত হিংস্র লোভের আঘাত
> আমরা ফিরাবো সেই খাদ্যলোভী রাহুর তরাস (মাহমুদ ৫৮)।

বর্ণিল প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে চিরকাল প্রভাবিত আবহমান বাংলার জনসমাজ। এই সমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আচার-আচরণ, নিয়ম-শৃঙ্খলা তথা সাংস্কৃতিক জীবনের অনবদ্য দলিল হলো *সোনালী কাবিন*। 'সোনালী কাবিন' শিরোনামের চৌদ্দটি সনেটের শরীর জুড়ে কেবলই এই বাংলার রূপ। এখানকার লোকজ জীবনাচার, বিশ্বাস, সম্পর্ক, মিলন, বিচ্ছেদ ও হাসি-আনন্দে পূর্ণ যেন প্রতিটি সনেট। তেরো নম্বর সনেটে দেখা যায় বাঙালির যাপিত জীবনের এক চমৎকার দৃশ্যের উপস্থাপন। যেখানে ফুটে ওঠে বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রাত্যহিক জীবনযাপন। কৃষিজীবী সমাজে লোকজ রীতিতে নববধূকে বরণ করে নেওয়া হয়। আনন্দঘন এ রীতি একান্তই বাঙালির। কবির ভাষায়,

> মঙ্গলকুলোয় ধান্য ধরে আছে সারা গ্রামবাসী
> উঠোনে বিন্নীর খই, বিছানায় আতর, অগুরু (মাহমুদ ৫৮)।

বাংলার কৃষিজীবী পরিবার এভাবেই তাদের নিজস্ব রীতিতে নববধূকে ঘরে তুলে নেয়। এ উপলক্ষ্যে লোকজ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এক উৎসবমুখর আমেজ। বিয়ের পরে নবদম্পতির সংসার জীবনও কৃষিজীবী সমাজের নিয়মেই পরিচালিত হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবিকাই হবে কৃষি। তাই কবি তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত লাঙ্গল-জোয়াল পরম যত্নে আঁকড়ে রাখেন। কৃষক তার শরীরের ঘামেই জীবনকে সামনের দিকে পরিচালিত করে। নিজেদের উৎপাদিত শস্যেই খাদ্যের চাহিদা পূরণ করবে। ভাত, মাছ-মাংস ইত্যাদিই হবে বাঙালির নিজস্ব খাবার। তাইতো কবির দীপ্ত উচ্চারণ,

> বৃষ্টির দোহাই বিবি, তিলবর্ণ ধানের দোহাই
> দোহাই মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর,
> লাঙল জোয়াল কাস্তে বায়ুভরা পালের দোহাই
> হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোন কবি করে না কসুর (মাহমুদ ৫৯)।

সোনালী কাবিন এর কবিতাগুলোতে এভাবেই কবি চিরকাল বাঙালি হয়ে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কবি তাঁর এই দীপ্ত উচ্চারণকেই চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করেন যার ব্যতিক্রম হবে না কোনোদিন। কবির এই শপথ অক্ষুণ্ন থাকবে সর্বদা। সমালোচক বলেন,

> আবহমান বাংলার বাঙালির জীবন-যাপন, মৃত্যুর সীমারেখাকে অতিক্রম করে ভাষা আর প্রেমময় কাব্যের শপথ নান্দনিকতায় পাঠকচিত্তকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে যায়, আল মাহমুদের সোনালী কাবিন (কমরুদ্দিন ৩১)।

আল মাহমুদ ছাড়াও বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এর প্রভাবে গড়ে ওঠা জনপদের জীবনযাপন তথা; হাসি, কান্না, আনন্দ, লড়াই-সংগ্রামসহ বহু লোকজ অনুষঙ্গ নিয়ে কবি জসীম জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) ও জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) সহ আরও অনেক কবি অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। কৃষিজীবী গ্রাম বাংলার নিখাঁদ রূপের কাব্যিক প্রকাশে জসীম উদ্‌দীন স্বতন্ত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। *রাখালী* (১৯২৭), *নক্সী কাঁথার মাঠ* (১৯২৯), *বালুচর* (১৯৩০), *ধানখেত* (১৯৩৩), *সোজন বাদিয়ার ঘাট* (১৯৩৩) প্রভৃতি কাব্যে এই বাংলার প্রকৃতি ও জনজীবনের নানন্দিক চিত্রের দেখা মেলে। বাংলার বর্ণময় প্রকৃতি ও জনজীবন সংলগ্নতাই জসীম উদ্‌দীনকে পল্লিকবি অভিধায় ভূষিত করেছে। এছাড়াও বাংলা সাহিত্যের শুদ্ধতম কবি বলে খ্যাত জীবনানন্দ দাশও বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে হিরন্ময় সব কবিতার সৃষ্টি করেছেন। বাংলার অপরূপ নৈসর্গিক বৈচিত্র্যের অনন্য উপস্থাপনে জীবনানন্দ দাশ তাঁর *ঝরা পালক* (১৯২৭), *বনলতা সেন* (১৯৪২) এবং *রূপসী বাংলা* (১৯৫৭) ইত্যাদি কাব্যের দ্বারা পাঠক এবং সমালোচক উভয় শ্রেণিরই মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলার অনাবিল প্রকৃতি ও জনজীবনের শৈল্পিক উপস্থাপনে কবি জসীম উদ্‌দীন ও জীবনানন্দ দাশের মতো আল মাহমুদও ঈর্ষণীয় সফলতা অর্জন করেছেন। তবে রচনার শিল্পগুণ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে তৈরি করেছেন নিজস্ব এক কাব্যভুবন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> আল মাহমুদের কাব্যের একদিকে প্রকৃতি জীবনের নিখুঁত বর্ণনা কবি জীবনানন্দের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আল মাহমুদ জীবনানন্দও নন জসীম উদ্‌দীন ও নন (কমরুদ্দিন ২৭)।

সোনালী কাবিন কাব্যে আবহমান বাংলার বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রকৃতিসংলগ্ন মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠেছে। বর্ণময় ভূ-প্রকৃতি এই জনপদের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশের অন্যতম অনুষঙ্গ হল নদী। উজান থেকে নেমে আসা হাজারো নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই জনপদের জীবন ও জীবিকা। নদীবাহিত পলির প্রভাবে কৃষি এদেশের মানুষের প্রধান ও আদিমতম পেশা। এ জনপদের অস্তিত্বের বিকাশে যেমন রয়েছে নদীর অবদান, তেমনই এই নদী যখন ফুঁসে ওঠে তখনই এখানকার মানুষকে শুরু করতে হয় ভিন্ন এক লড়াই। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হয় মানুষকে। এদেশের মানুষের জীবন সংসারে সুখ-দুঃখের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে নদীর জল। এভাবে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, পাহাড়-পর্বতের প্রাকৃতিক পরিবেশই এদেশের মানুষের জীবনধারার প্রধানতম নির্মাতা।

প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ আল মাহমুদের কবি জীবনকে করেছে অনন্য এবং এই অনন্যতাই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক জীবন ঘনিষ্ঠতাই *সোনালী কাবিন* এর মূল সুর। কবিতাগুলোতেও তাই বাংলার ভূ-প্রাকৃতিক জীবনের যাবতীয় অনুষঙ্গ পূর্ণমাত্রায় স্থান করে নিয়েছে। ফলে বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায় *সোনালী কাবিন* একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে।

তথ্যসূত্র

আহমদ, কমরুদ্দিন। *আল মাহমুদ : কবি ও কথাশিল্পী* । নন্দন প্রকাশন ২০১৫।

আহমদ, কমরুদ্দিন। *আধুনিক কবিতা : প্রাসঙ্গিক বিবেচনা* । শব্দশিল্প প্রকাশন ২০১১।

ইসলাম, ফাইজুল। *আল মাহমুদের সোনালী কাবিন* । নওরোজ সাহিত্য সম্ভার ২০১৩।

ইকবাল, শহীদ। *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস (১৯৪৭-২০০০)*। রোদেলা ২০১৩।

মাহমুদ, আল। *সোনালী কাবিন* । নওরোজ সাহিত্য সম্ভার ২০০৬।

রহমান, গাউসুর। *আল মাহমুদের কবিতার বিষয়-আশয়* । অ্যাডর্ন পাবলিকেশন ২০১৩।

হোসেন, খোন্দকার আশরাফ। *বাংলাদেশের কবিতা: অন্তরঙ্গ অবলোকন* । বাংলা একাডেমি ১৯৯৪।